নয়া-ঔপনিবেশিকতার জমানায় বাংলা ভাষার কোণঠাসা হওয়ার ইতিহাসের একটি পর্ব

পুষ্কর দাশগুপ্ত

ঔপনিবেশিকতার যুগের পুরনো ইতিহাস: মেকলের জারজরা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় শিকড় গেড়ে বসার পর থেকে তাদের সরকার, মুৎসুদ্দি, দালালের কাজ করে কিছু দিশি লোক জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। তারপর কোম্পানি ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাজিত করে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দখলদারি পাওয়ার পর এই উপনিবেশের পরিধি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে । কলকাতা হয় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। দলে দলে ভাগ্যান্বেষী 'কলিকাতা কমলালয়ে' এসে হাজির হল। ঔপনিবেশক সাহেবদের অধীনে কাজ করতে গেলে এক আধটু সাহেবদের বুলি বোঝা দরকার , উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা দু চারটে ইংরেজি বুকনি আউড়াতে শিখে সাহেবদের নেক নজরে পড়ল আর বেশ দু পয়সা কামিয়ে দিশি সমাজে কেউকেটা বনে গেল । হেস্টিংসের ব্যক্তিগত ব্যবসার মুন্সি শোভাবাজারের নব মুন্সি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবে পরিণত হল। দিশি সমাজে ইংরেজি শেখার চাহিদা দেখা দিল। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য প্রথমে কিছু বিদেশি, ফিরিঙ্গি, অল্পস্বল্প ইংরেজি জানা দিশি লোক ইংরেজি পাঠশালা খুলল। তারপর ১৮১৭ সালে দিশি সমাজের কেউকেটা নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব, ইয়োরোপীয় বণিকদের দালালি করে বিরাট সম্পদের মালিক পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এবং আরও কয়েকজনের মদতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি ও ইয়োরোপীয় বিদ্যা শেখার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। ১৮৩০ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার বিবরণ অবস্থাটা স্পষ্ঠ করে:

> হিন্দুকালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধীইত্যাদি প্রায় বিষয়ি লোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে.. (সমাচার চন্দ্রিকা, ১৫ চৈত্র ১২৩৬)।[১]

এই অবস্থায় ১৮৩৪ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ঔপনিবেশিত ভারতে আসেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ভারতবর্ষের বিশাল উপনিবেশের শাসন-শোষণের প্রয়োজনে দিশি কম্প্রাদর-কর্মচারি তৈরি করার জন্য ঔপনিবেশকদের ভাষায় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মনে পড়ে, ১৪৯২ সালে ইস্পানি পণ্ডিত আন্তোনিয়ো দে নেব্রিহা (Antonio de Nebrija, ১৪৪১-১৫২২) স্প্যানিশ ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।এই ব্যকরণ তিনি

রানি ইজাবেলাকে উৎসর্গ করেছিলেন। ওই বই দিয়ে তিনি কী করবেন রানির এই প্রশ্নের উত্তরে নেব্রিহা বলেন, শ্রদ্ধেয় রনি, ভাষা হল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে কার্যকারী অস্ত্র। সে বছরই স্প্যানিশ রানি ইজাবেলা-র পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টোফার কলম্বাস নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার ও ইস্পানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করেন।

মেকলে ১৮৩৫ সালে তাঁর ঔপনিবেশিত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্মারকলিপিতে স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের ইংরেজি-মাধ্যম যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করেন তার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল:

> এই মুহূর্তে আমরা অবশ্যই বিশেষ একটা শ্রেণী গড়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।যারা হবে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা শাসন করছি তাদের আর আমাদের মধ্যে দোভাষি, এমন একদল মানুষ যারা হবে রক্তে আর গায়ের রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বিচারবুদ্ধিতে ইংরেজ।[২]

অবশ্য কট্টর ইভ্যাঞ্জিলিস্ট খ্রিস্টান মেকলে ১৮৩৬ সালের ১২ই অক্টোবর কলকাতা থেকে তাঁর বাবাকে লেখা একটি চিঠিতে এই প্রস্তাবের পরোক্ষ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন:

> আমাদের ইংরেজি স্কুলগুলির দারুন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে।... হিন্দুদের ওপর এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বিরাট। ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছে এমন কোনো হিন্দুই কখনোই তার ধর্মে আন্তরিকভাবে অনুরক্ত থাকতে পারে না।... আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে আজ থেকে তিরিশ বছর পরে বাংলাদেশের ভদ্রশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে একজনও মূর্তি-উপাসক থাকবে না । আর ধর্মান্তরিত করার কোনো প্রয়াস ছাড়াই ব্যাপারটা সম্পন্ন হরে.. ।[তথ্যসূত্র ৩]

যাই হোক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মেকলে-র অভিপ্রেত কিছু ' 'রুচি, মতামত, নৈতিকতা আর বিচারবুদ্ধিতে ইংরেজ' আর 'গায়ের রঙে ভারতীয়' তৈরি হল। কোটি কোটি ভারতীয়দের মধ্যে এরা সংখ্যয় নগণ্য।এদেরই একটা অংশ ইংরেজের বশংবদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিশ্বস্ত কম্প্রাদরের ভূমিকা নেয়।

ইতিহাসের গতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর তারপর তিরিশের মন্দা ইয়োরোপের ঔপনিবেশক শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যথেষ্ঠ নড়বড়ে করে তুলেছিল আর এরই মধ্যেই শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধ ওই দেশগুলিকে প্রায় দেউলিয়া করে তুলল। এর পর ইয়োরোপের ঔপনিবেশক শক্তিগুলির পক্ষে উপনিবেশের প্রশাসন, সামরিক সংস্থা ইত্যাদি চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তারা বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মেনে রক্ষা পেয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার ক্ষেত্রেও তারা এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব, পদ্ধতি ও দৃষ্টান্ত (ফিলপিনস, ল্যাটিন আমেরিকা) মেনে নয়া-ঔপনিবেশিকতার পথ অবলম্বন করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কুড়ি বছরের মধ্যে ইয়োরোপের ঔপনিবেশক শক্তিগুলি পুরনো উপনিবেশগুলিকে আপাতভাবে স্বাধীনতা দিয়ে দিল।

ভারত 'স্বাধীন' হল, অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে তথাকথিত 'স্বাধীনতার' নামে মার্কিনি নেতৃত্বে দলবদ্ধ পশ্চিমের নয়া-ঔপনিবেশিকতা কায়েম হল। সুবিধাভোগী পূর্বোক্ত কম্প্রাদরদের বংশধররা নয়া-কম্প্রাদরের ভূমিকা নিয়ে দেশের শাসন-শোষণ ব্যবস্থার

কর্ণধার হয়ে বসল। তখন থেকে 'মেকলের জারজ' এই সামান্য সংখ্যক সুবিধাভোগী দেশের সংখ্যাগুরু বিপুলসংখ্যক মানুষকে মানবিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজি ভাষাকে শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্য-প্রযুক্তির ভাষা করে রাখল। এই অবস্থায় ইংরেজি না জানা বা/এবং কম জানা বিপুলসংখ্যায় সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীর অবস্থাটা করুণ। সরকারি কাগজ-পত্র, চিঠি, আইন-কানুন, পড়া, বোঝা, জানার, কোনো সমস্যায় আবেদন করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, ভোগ্যপণ্য বা ওষুধ কিনে তার নাম অথবা ব্যবহারের নিয়ম বোঝার অধিকার তাদের নেই, বৈদ্যুতিন জগৎ তাদের আয়ত্তের বাইরে। অন্যদিকে মেকলের জারজ বা ইংরেজি -নবিশ বাঙালিদের অবস্থাটা কী? এরা তোতাবৃত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যায় পাশ্চাত্য-বাচন আউড়ায়। এদের অবদান, মৌলিক মনন, বিশ্লেষণ, সৃষ্টি, আবিষ্কার অতি নগণ্য। গত দুশ বছরের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। একশ বছর আগে রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উপলব্ধি করেছিলেন:

> ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে... আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক বিশেষ কিছু হয় নাই।...
> আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয় ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা, কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।...
> ইংরাজের প্রসাদে শিখিয়াছি যথেষ্ট....কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম! উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ত কিছুই দেখি না...
> ষাট বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি , গড়িতে শিখি নাই,... আমরা পরের কথা আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না।... (ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম, ১৮৯৫)।[৪]

কাশীপ্রসাদ ঘোষ থেকে সরোজিনী নাইডু অব্দি অনেকেই ইংরেজিতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা কেউ কখনো ঔপনিবেশকদের কাছ থেকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান নি। সাম্প্রতিককালে যেসব ইংরেজি-নবিশ ভারতীয় বা/এবং বাঙালি তোতাবৃত্তিতে নৈপুণ্য দেখিয়ে খ্যাতি লাভ করেন বা/এবং ইংরেজিতে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে) আবোল-তাবোল লেখেন নয়া-ঔপনিবেশক শক্তি তাদের পশ্চিমি প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় স্বীকৃতি দিয়ে তাদের কল্পরূপ তৈরি করে।[৫] এটা হল গিয়ে নয়া-ঔপনিবেশিকতার প্রোথিত-মূল প্রতিষ্ঠার কৌশলের অঙ্গ নয়া-ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের নীতির অংশ। স্মরণীয় ১৯৪৩ সালে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডিগ্রি নেওয়ার অভিভাষণে উইনস্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্টের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার প্রচার ও প্রসারের মার্কিন-ব্রিটিশ যৌথ পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর আলোচনার কথা বলেন। এই পরিকল্পনার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি বলেন:

> ভাষার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের দেশ বা জমিজমা কেড়ে নিয়ে তাদের শোষণের মাধ্যমে পিষে ফেলার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান লভ্যাংশ এনে দেয়। ভবিষ্যতের সাম্রাজ্য হবে মানসিকতার সাম্রাজ্য।[৬]

ভাষার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিষয়ে এই পরিকল্পনাই নয়া-ঔপনিবেশিকতার ভিত্তি।

সচেতন বাঙালি যাঁরা মেকলের জারজের দলে ঢোকেন নি

অবশ্য উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা সামান্যসংখ্যক বাঙালিকে মেকলের জারজদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারে নি, তার পরিবর্তে ঐ শিক্ষা তাদের চেতনাকে জাগ্রত এবং প্রসারিত করে। এরা দেশ, জাতি আর বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক বাংলা ভাষার ব্যবহারের পরিধির বিস্তার এবং সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

যে মধুসূদন দত্ত প্রথম যৌবনে ইংরেজি ভাষার কবি হবার স্বপ্ন দেখতেন, যিনি ইংরেজি বাদ দিয়েও সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি ও ইতালিয়ান ভাষা জানতেন, তিনি ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের ভের্সাই শহর থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন:

> তুমি জান, গৌর আমার, গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা ইয়োরোপীয় ভাষায় জ্ঞান হল বিরাট আর আবাদ করা একটা ভূখণ্ড অধিকারের করার মতো ব্যাপার – ঐ ভূখণ্ড অবশ্যই বৌদ্ধিক । ...ইয়োরোপ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় ব্যাপার,... কিন্তু আমরা যখন পৃথিবীকে কিছু বলব তখন তা যেন আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বলি। নিজেদের ভেতরে নতুন চিন্তার উৎসার রয়েছে বলে যারা বোধ করে তারা যেন অবিলম্বে নিজেদের মাতৃভাষার দিকে যাত্রা করে।... নিজের ভাষায় দক্ষতা নেই এমন কোনো ব্যক্তির 'শিক্ষিত' বলে পরিচিত হতে চাওয়ার আত্মম্ভরিতাকে আমি ঘৃণা করি..
>
> শেষ পর্যন্ত, আমাদের নিজেদের ভাষার চর্চা আর তার সমৃদ্ধি-সাধনের তুলনীয় আর কিছুই হতে পারে না। তুমি কি ভাব যে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স অথবা জার্মানি বা ইতালির কবি আর প্রবন্ধকারের দরকার আছে ? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মিল্টনের নিজের মাতৃভাষা আর জন্মভূমির জন্য কিছু করার মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে তাবৎ প্রতিভাধর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুক।[৭]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণে বলেন:

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে জ্ঞান প্রচারিত না হলে জাতি হিসেবে আমরা কোনো সর্বব্যাপ্ত আর বিস্তৃত কৃষ্টির অধিকারী হতে পারব না। অতীত আমাদের যে শিক্ষা দেয় তার কথা ভেবে দেখুন। অসংখ্য আধুনিক ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো দীপ্তিময় হয়ে ওঠার আগে অব্দি ইয়োরোপে মধ্যযুগের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, —তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো জনসাধারণের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত চারপাশের অজ্ঞানের গভীর অন্ধকার কখনোই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে না ।[৮]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে উদ্বুদ্ধ তরুণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষা বাংলা, হিন্দি বা উর্দুকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ইত্যাদি কয়েকজন সমর্থন করলেও মেকলের জারজ বাঙালিদের দলবদ্ধ বিরোধিতায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় লেখেন:

> ...বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি-চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কী কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।
>
> (ন্যাশনল ফন্ড , ভারতী, কার্তিক, ১২৯০)।[৯]

তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২ বছর। এর পর সারা জীবন তিনি সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন:

> আমাদের ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। ...আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।... আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,-কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে!... বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।
>
> (শিক্ষার বাহন, ১৩২২)।[১০]

ছিয়াত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন:

> ...আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।
>
> (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ভাষণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)।[১১]

না, রবীন্দ্রনাথের কামনা পূর্ণ হয় নি। বহুকাল কেটে গেল, বাংলা ভাষা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল, তার সঙ্গে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে রইল সংখ্যাগুরু কোটি কোটি বাঙালি। তারপর বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ষষ্ঠ দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষার ব্যবহার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা এগোল; শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৪- ১৯৩৮)তখন মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয় বাংলায় (মাতৃভাষায়) পড়া এবং পরীক্ষা দেওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন অভিভাষণ পাঠ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত একটি সমিতি বাংলা বানান সংস্কার করে নতুন বানান-বিধি প্রকাশ করল। পরিভাষা কমিটি গঠন করা হল। এর পর ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট ও স্নাতক (পাস) পরীক্ষা বাংলায় দেওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে স্থির করা হয়েছিল, তা নিয়ে অনেক ধানাই পানাই হলেও তা কখনোই কার্যকরী করা হয় নি।

বাংলা ভাষার সূর্যাস্ত

তার পর বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে নতুন করে সর্ব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অঘোষিত বিদায় সূচিত হল। তারপর চার দশক পরে এখন বাংলা ভাষার করুণ অবস্থা। বাংলা ভাষা প্রশাসনে ব্যবহৃত হয় না, পাড়ার মুদি, বেঞ্চিওয়ালা চায়ের দোকান, রাস্তার হকার, বাজারের সব্জি, ফল কি মাছবিক্রেতার বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্যে এই ভাষার ব্যবহার নেই, তথ্য-প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক বা মানবিক বিজ্ঞান, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা কোথাও বাংলা ব্যবহৃত হয় না। এ ভাষা আজও মোটামুটিভাবে কম্প্যুটারায়িত হয়নি, ২৫ কোটি ভাষাভাষীর এই ভাষা আজো বৈদ্যুতিন জগতের খুদে একটা টুকরো দখল করে নিজের ন্যূনতম আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি । ক্রমশ বাংলা ভাষা 'নিম্নবর্গীয়' বাঙালির পারস্পরিক সংজ্ঞাপনেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে, কলকাতা আর ঢাকায় বড় দোকান কি রেস্তোরাঁয় ঢুকে ইংরেজি না বলে বাংলা বললে খুব একটা ইজ্জত পাওয়া যায় না। মোটামুটি সঙ্গতি থাকলেই লোকে শিশুবয়স থেকে ছেলেমেয়েকে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পাঠায়, ইংরেজি না বললে চলনসই চাকরি বাকরিও পাওয়া যাবে না। বাংলায় শুধু কিছু গপ্পো-কবিতা লেখা হয়, তবে যে ভাষায় সর্ববিদ্যার চর্চা হয় না সে ভাষার স্রোত মজে যায়, জলে পচন ধরে, তার সৃজনশীলতা হ্রাস পায়, সাহিত্যের মান ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে, চর্বিত-চর্বণে পরিণত হয়। তার পাঠকের মানও নিম্নগামী হয়, পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্তের পরিধির বিস্তারও ক্রমশ কমে যায়। বাংলা সাহিত্যের অবস্থা আজ দীপ্তিহীন, মেধাহীন – করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠছে ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা নিয়ে কী ভেবেছিলেন বা কী বলেছিলেন তা নিয়ে কেউ আর আজ মাথা ঘামায় না। সব কিছুর মাথায় বসে রয়েছে মেকলের জারজরা আর ইংরেজি ভাষা যা শতকরা ৯৭ জন বাঙালি জানে না, বুঝতে পারে না।

বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে রা কাড়ার উপায় নেই, মেকলের জারজরা তো বটেই, 'কলকাতা থেকে নিয়মিত বিমানে ভ্রমণকারী প্রতি দু'জনের একজন, পশ্চিমবঙ্গে নামকরা

গাড়ির মালিকদের ৪০%, রাজ্যের ওয়াশিং মেশিন আছে, এমন মানুষদের অর্ধেকেরও বেশি, পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক মাইক্রোওয়েভ মালিক, রাজ্যের সমস্ত এয়ার কন্ডিশন মালিকের ৪০%' – এইসব সংস্কৃতিবান পাঠকরা যে খবরের কাগজ নিয়মিত পড়েন বাংলা ভাষার সেই দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা 'বাংলাবাজ' বলে গালি দেবে।

> [নিয়মিত বিমানে ভ্রমণকারী, নামকরা গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ আর এয়ার কন্ডিশনারের মালিক – এঁরাই তো সংস্কৃতিবানদের শিরোমণি, এঁরাই তো সংস্কৃতির কমলবনে বিএনডব্লু-তে করে মত্ত মাতঙ্গের মতো বিহার করছেন, গাড়িতে রয়েছে এঁদের প্রাণাধিক প্রিয় আনন্দবাজার পত্রিকা। সত্যি বলতে কী, গিনিজ বুক-এর কর্তৃপক্ষ যে অপদার্থ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারনা! ওরা এখনো 'ইংরেজিখোড়' (সংস্কৃতিহীন 'বাংলাবাজদের' অপভাষার অভিধা) বাংলা খবরের কাগজ আনন্দবাজারের নাম গিনিজ বুকে মোটা হরফে ছাপায় নি । পৃথিবীর একমাত্র পত্রিকা যা যে ভাষায় প্রকাশিত হয় সে ভাষার ব্যবহার বা বিস্তৃতির চরম বিরোধী! এমন দেশটি কোথা ও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!...]

২৫ কোটি ভাষাভাষীর ভাষা বাংলার এই দুরবস্থা, অবক্ষয়ের ইতিহাস নিয়ে আজকাল কেউ আর মাথা ঘামায় না। কোনো আলোচনা হয় না এ ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা কেন জানিনা কেউ কেন কখনোই বলেন না। এই পর্বটা হল ষাটের দশকের শেষে আর সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে নক্সাল আন্দোলন নামে পরিচিত মাওবাদী কম্যুনিস্ট আন্দোলন।বস্তুত এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা নয়া-ঔপনিবেশিকতার পরিবর্তিত রণকৌশল বাজার-অর্থনীতি আর তার বিবর্তিত পরিণত রূপ বিশ্বায়নের পরিপোষক ভাষিক আর সাংস্কৃতিক নীতির আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কে কেন জানি না এই দুই বিষয় সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হয়।

১৯৪৭ সালে যখন ভারত 'স্বাধীন' হয় তখন কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মাধ্যমিক স্কুল ছিল বাংলা-মাধ্যম। ১৯৫১ সালে কলকাতা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন-প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল দুশ বিয়াল্লিশটি (স্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত ছেলেদের স্কুল ৬০ + মেয়েদের স্কুল ৬৩ + অস্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুল ১০৬) । এর মধ্যে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু-মাধ্যম স্কুল ছিল সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলোটি, বাকি সবই বাংলা-মাধ্যম। ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল ছিল সাত-আটটি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট (খ্রিস্ট) ধর্মীয় মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মিশনারি স্কুল নামে পরিচিত এই স্কুলগুলিতে যাঁরা ছেলেমেয়েদের পাঠাতেন তাঁরা হলেন: ১. অ্যাংলো-ইন্ডয়ান সম্প্রদায়; ২. বাঙালি খ্রিস্টানদের একটি অংশ, কারণ এসব মিশনারি স্কুলে খ্রিস্টান ছাত্ররা নানান ধরনের সুবিধা পেত, এছাড়া খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার একটা ভাবানুষঙ্গ গড়ে উঠেছিল ; ৩. গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলির চাকরি করা ভারতীয়রা – যাঁরা ঘনঘন স্থান পরিবর্তনের বাস্তব কারণে সন্তানদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হতেন ; ৪. ছেলেকে ইংল্যাণ্ডে ইটন বা হ্যারোর পাবলিক স্কুল, মেয়েকে সুইজারল্যাণ্ডের ফিনিশিং স্কুল তো দূরের কথা, সিমলা, নৈনিতাল কি দার্জিলিং-এর ইংরেজি স্কুলে পাঠানোও যাঁদের সাধ্যে কুলোত না অথচ যাঁরা

ছেলেমেয়েকে ব্রাউন ছোটসাহেব কি ছোটিমেমসাহেব বানানোর স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পিটুলি-গোলা জলে দুধের সাধ মেটানোর জন্য ছেলেমেয়েদের কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলে পাঠেতেন। এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এদেশে বসে ইয়র্কশায়ারের মিস্টার ও মিসিস মার্টিনের ছেলে ক্রিসমাসে কী করে তার বিবরণ পড়ত। সাধারণত এরা দেশের অবস্থা, সমাজ বা রাজনীতির সমস্যা বা পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামাত না, কর্মজীবনে বিলিতি সওদাগরী হৌসে সাদা চামড়ার বড় সাহেবদের বশংবদ মেজ, সেজ কি ছোট সাহেব হওয়াটাই ছিল এদের জীবনের চরম লক্ষ্য। বস্তুত এসব ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের বাঙালি ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে সাধারণত বিলিতি সওদাগরি অফিস, চা-বাগান, সওদাগরি জাহাজ ইত্যাদির ছোট সাহেব হতেন। শিক্ষা আর ভাষার নিয়ন্ত্রণে এরা দেশের মানুষ, সংস্কৃতি এবং জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় স্যুট-কোট-টাই-গাউন, লাঞ্চ-ডিনার, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং টেবল ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকত। অন্যদিকে যেসব ছেলেমেয়ে শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বা মানবিক বিজ্ঞানের গবেষণা, প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বাংলা-মাধ্যম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উৎপাদন।

বিশ শতকের প্রথম থেকে, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারের পর বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই চেতনা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে "স্বাধীনতা"র পর প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তা ও মানসেকতার পরিণতি লাভ করে, এই মানসিকতা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্রমশ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সহমর্মী করে তুলতে থাকে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বামপন্থী প্রবণতা পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে অনুমোদিত, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিক পরিণতি লাভ করল। এর পর বাইেরর ঘটনাক্রমে দেখা যায়, ষাটের দশকের গোড়ায় চিন-ভারত বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলস্বরূপ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। এরপর আবার আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের (রুশ ও চিনে পন্থার) বিভাগের ঢেউ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে আরো বিভক্ত করে, দেখা দেয় সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী মাওবাদী নকশালপন্থীরা (১৯৬৭) । তবে ভেতরের দিক থেকে বলা যায়, নিম্নমধ্যবিত্ত দ্বিধা, বাঙালি/ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক স্কিজোফ্রেনিয়া, ক্ষমতা-লোভী সুবিধাবাদ, প্রতিষ্ঠানিক বামপন্থার নাস্ত্যর্থক পরিণতির মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ঠ হয়ে উঠছিল। তাই প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার মধ্যে পথের সন্ধান না পেয়ে ষাটের দশকের শেষে বাঙালি মধ্যিবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শবাদী নতুন প্রজন্মের আশাভঙ্গ এবং অন্বেষণের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটল। অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এই অতর্কিত বিস্ফোরণই হল "নকশাল-আন্দোলন"। এই আন্দোলনের সময় তথাকথিত বুর্জোয়া শিক্ষার বিরুদ্ধে পরিকল্পনাহীন, বিকল্পের চিন্তাহীন বিক্ষিপ্ত আক্রমণের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীন শক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিকল্পিত ধ্বংসাত্মক অরাজকতার সৃষ্টি করল তার প্রথম শিকার হল বাঙলা-মাধ্যম মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলগুলো। এই নকশালপন্থী বিদ্রোহের আক্রমাণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা। শুরু হয় শিক্ষায়তন, পরীক্ষা ভণ্ডুল ইত্যাদির মাধামে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের কার্যক্রম। নকশালপন্থীরা শহরাঞ্চলে লুম্পেন-প্রলেতারিয়েৎদের বিপ্লবের সঙ্গী করে তথাকথিত আর্বান গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলতে চাইলেন। নকশালপন্থীদের যথার্থ সংগঠন, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বা পরিকল্পনা বলে প্রায় কিছুই ছিল না। এছাড়া কর্মীদের আদর্শে দীক্ষিত এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচিও ছিল না বললেই হয়। একথা আজ যে-কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে স্পষ্ট যে এঁদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও হঠকারিতার সুযোগ নিয়ে দলের তথাকথিত লুম্পেন-প্রলেতারিয়েৎদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক

লুম্পেন-প্ররোচক বেনোজলের মতো ঢুকে পড়ে। এদের কাজ হল একদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে নকশালপন্থী আন্দোলনকে জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা, অন্যদিকে বামপন্থী ধ্যানধারণার বীজতলা বাংলা-মাধাম স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠানিক মূর্তি ধ্বংস করা। আর এই অবস্থাকে নানা উপায়ে রাজনীতি-বিমুখীনতার বিস্তারের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হল। কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের নামে দীর্ঘ ঐতিহ্যযুক্ত বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলি আক্রান্ত হল; গণ-টোকাটুকি, পরীক্ষা ভণ্ডুল, পরীক্ষককে অপমান ও আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি করা হল, বিশৃঙ্খলা ও ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি হওয়া নিরাপত্তাহীন অবিদ্যায়তনিক পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে এই স্কুলগুলির শিক্ষণব্যবস্থা শিকেয় উঠল। একই সময়ে ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য আর্থিক পাওনার আদায় প্রায় বন্ধ হওয়া এবং সরকারি সাহায্যের অপর্যাপ্তি ও অনিয়মিততার ফলে বেশিরভাগ বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও চরমে ওঠে। ফলে এই নৈরাজ্যের মধ্যে মানসিকভাবে নির্যাতিত বাংলা-মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকদের নিয়মিত মাস-মাইনে পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসম্মানের কারণে যাঁর অন্য কোনোভাবে জীবিকা-অর্জনের এতটুকু উপায় আছে, নিদেনপক্ষে সরকারি বা বেসরকারি অফিসে অবরবর্গীয় কেরানির পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তিনি বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে আর রাজি ছিলেন না। পড়ানোর যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং ইচ্ছে রয়েছে এমন কেউ আর বাংলা-মাধ্যম স্কুলের পথে পা বাড়াতে চাইলেন না। বাঙলা মাধ্যম, দীর্ঘকালের ঐতিহ্যপূর্ণ স্কুলগুলোর আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার মান এবং পরিবেশের দ্রুত চূড়ান্ত অধোগতি হল, আর পাশাপাশি গজিয়ে উঠল, ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার নিল অসংখ্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এসব ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল আক্রান্ত হল না, এসব স্কুলে পরীক্ষা ভন্ডুল হল না, শিক্ষক-শিক্ষিতরা নিগৃহীত হল না। অ্যাসবেসটসের ছাউনিওয়ালা বালিগঞ্জের সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কয়েকটি নতুন বাড়ি হল – ছাত্রসংখ্যা বাড়তে বাড়তে বারো হাজার ছুঁল, স্কুলের নাম ছাত্রসংখ্যার রেকর্ডের জন্য গিনিজ বুকে স্থান পেল।[১২] দু-তিনটি সরকারি স্কুল বাদ দিয়ে বাকি বাংলা স্কুলগুলি বাত, পিত্ত, কফে ভোগা রোগীর মতো কোনোরকমে ধুঁকতে থাকল। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালিরা – যাঁদের বাড়িতে একাধিক প্রজন্মের পড়াশোনার চল ছিল তাঁরা অন্যান্য খরচ যতটা পারেন কমিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে লাগলেন। বর্ধিষ্ণু মফস্বল শহরগুলিতেও কিছু কিছু ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠতে লাগল। শহরে নিতান্ত গরিব বা/এবং পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকেরা আর গ্রামবাসীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিম্নমানের বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে লাগলেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যে চিন্তা উনিশ থেকে বিশ শতকের ষাটের দশক অবধি বিবর্তিত হচ্ছিল, যা নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলছিল, তা হঠাৎ পুরোপুরি থেমে গেল। আজকের শহু বাঙালি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের জন্য বির্বাচিত প্রথম ভাষা হল ইংরেজি। দ্বিতীয় ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দি (সর্বভারতীয় সরকারি ভাষা) তাছাড়া বাংলায় কম নম্বর দেওয়া – ফলে পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার মধ্যেও যে কী রাজনীতি বা কী উদ্দেশ্য কাজ করছে তা আমাদের জানা নেই। এই পরিস্থিতিটা ক্রমশ স্বাভাবিক হিসেবে স্থিতি লাভ করল। উচ্চতর শিক্ষা, পেশাদারী শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এমন কি সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামানো, বহির্মুখী (extravert) চটপটে ইংরেজি বুলি-আউড়ানো ছেলেমেয়েদের

অগ্রাধিকার স্বীকৃত হল। গত তিরিশ বছরে ইংরেজি স্কুলের উৎপাদন নতুন প্রজন্ম চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ক্ষমতাসীন সুবিধাভোগী শাসক-শোষক শ্রেণীর পক্ষে নিরাপদ, দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহহীন, স্বার্থপর এবং সুযোগসন্ধানী এই প্রজন্ম ক্রমশ পরিপুষ্ট হচ্ছে, শাসক-শোষক শ্রেণীর কাছে মদত পাচ্ছে। 'অনগ্রসর' বাঙলা ভাষা নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যথা নেই, নিজেদের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য শিক্ষা আর কর্মের জগতে ইংরাজির আধিপত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে এরা বাধ্য। ইংরেজি এদের 'ক্ষমতা'। সুতরাং বাঙলা ভাষার সর্বস্তরে ব্যবহারের সম্ভাবনা সুদুর-পরাহত। এই ব্যাপারটা যে পরিকল্পিত ও সংগঠিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই; এর পেছনে ছিল শাসন কর্তৃপক্ষের গুপ্ত আরক্ষা কৃত্যকের মদত ও পরিচালনা এবং অনুমান করা যায়, বিদেশি (নয়া-ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক বা/এবং তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক) গুপ্ত আরক্ষা চক্রের যোগসাজশ, পরামর্শ ও পরিকল্পনা।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ও আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠার তাগিদে ইংরেজে-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের যে আন্তরিক প্রয়োজন কাজ করত তা অবসিত হয়েছে। ইংরেজি-শিক্ষিত সুবিধাভোগী শ্রেণী এখন ইংরেজি ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় ইংরেজি, ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদি পরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে ইংরেজিকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটা সাংস্কৃতিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী। বাংলা প্রচার-মাধ্যমগুলোও ঔপনিবেশিতের হীনমন্যতাবশত এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে। রাজনৈতিক-সামাজিক কৌশলের সাহায্যে নতুন শক্তি সঞ্চার ইংরেজি শিক্ষার এই নবীকরণ আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিপূর্ণ নয়া-ঔপনিবেশিক রূপান্তর। ফলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণী স্বতসিদ্ধভাবে নয়া-ঔপনিশকতার সহযোগী হতে বাধ্য, তাদের স্বার্থ, ক্ষমতা আর প্রভুত্বের ভিত্তি হল এই সহযোগিতা। স্বভাবত ইংরেজি ভাষার স্বপক্ষে প্রচারের পেছনে সমর্থন এবং মদত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।

বাঙলা ভাষা আজ সব দিক থেকে পোণঠাসা, পশ্চাদগামী। যে ভাষায় সর্ব বিদ্যা চর্চা হয় না, যে ভাষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, তার প্রকাশের পরিধি ও ক্ষমতা সীমিত হয়ে উঠতে বাধ্য, তার সাহিত্যও সীমাবদ্ধ হয়ে অল্পশিক্ষিত পাঠকের অবসর বিনোদনের উপকরণ হয়ে ওঠে। বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে আজকের বাঙলা সাহিত্যের হালও তাই। শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে মর্যাদা পেতে হলে ইংরেজিতে লিখতে হবে, আর বাঙলায় লেখা হবে অল্পশিক্ষিত আমজনতার কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য, তাদের 'ভোগ'-এর জন্য। তাতে কোনো ভাষার সন্ধান থাকবে না, বিষয় বস্তু-অনুসারী জটিলতা বা দুরূহতা থাকবে না, তা হবে সহজপাচ্য – সরল ও তরল। ভাবতে দুঃখ লাগে, বাঙলা ভাষায় কখনো জয়েস, প্রুস্ত, ফকনার, সোস্যুর, চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স, লেভি-স্ট্রোস, বার্ত, চমস্কি কি মিশেল ফুকো-র জন্ম হবে না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় বাঙালিত্ব তথা ভারতীয়ত্বের প্রতীক, তাই বাঙালি তথা ভারতীয় বলে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনে নতুন প্রজন্মের ইংরেজি-নবিশ বাঙালিদের অনেকেই আজ ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ পড়ে, 'মিস্টিক' রবীন্দ্রনাথ, 'ফিলজফার' রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি আউড়ায়। এরা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়তে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

রোমান্টিক কবিদের একজন, বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় ভাষাশিল্পী, ইংরেজি বা অন্য কোনো ইয়োরোপীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়ে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একথা বোঝার ক্ষমতা বিগত-চেতনা ইংরেজি-নবিশ বাঙালিরা আজ হারিয়ে ফেলেছে ।

তথ্যসূত্র

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত): সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির , প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ , পৃ.৭০-৭১।

২. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.
— Thomas Babington Macaulay, Minute on the Indian Education 2 February 1835.
http://www.mssu.edu/projectsouthasia/history/primarydocs/education/Macaulay001.htm.

৩. Our English schools are flourishing wonderfully… The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion… It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence…And this will be effected without any efforts to proselytize…
— George Otto Trevelyan The Life and Letters of Lord Macaulay, New York, Harper & Brothers, Vol. II, p.398.

৪. Wikipedia-র ভারতীয় লেখকদের তালিকায় যেকটি বাঙালি নাম খুঁজে পেয়েছি তা দেখলে চমকিত আর চমৎকৃত হতে হয়। এর মধ্যে বাংলা ভাষার লেখকের নামগুলি আমরা ইটালিক্সে উপস্থিত করেছি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, জীবনানন্দ … এঁরা কেউ নেই! বাকিদের মধ্যে অমিতাভ ঘোষ ছাড়া বাকিদের লেখা আমি পড়িনি। নিশ্চয় খুব বড় লেখক হবেন! তার উপর ষণ্ড জন +স্যাম খুড়োর ভাষায় লেখেন লেখক না হয়ে পারেন না!
Abhijit Bhaduri, Amit Chaudhuri , Amitav Ghosh , Barun Roy, Chitra Banerjee , Durjoy Datta, Bishwanath Ghosh, *Jagadish Chandra Bose*, Jhumpa Lahiri, Kunal Basu , *Mahasweta Devi*, *Nirupama Devi*, *Rabindranath Tagore*, Samit Basu , *Sarat Chandra Chattopadhyay*, *Sukumar Ray* , *Sunil Gangopadhyay*, Upamanyu Chatterjee,
List of Indian writers - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_writers ,Wikipedia
This is a list of notable writers who come from India or have Indian nationality.

৫. রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, সম্পাদনা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গ্রন্থমেলা, ১৯৫৭, প্রথম

খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩১০।

৬.The power to control language offers far better prizes than taking away people's provinces or lands or grinding them down in exploitation. The empires of the future are the empires of the mind. — *Winston Churchill:The Price of Greatness is Responsibility - 1943, Harvard.*

৭. European scholarship is good…but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those, who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue…I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language….

After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France or Germany or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us.

যোগীন্দ্রনাথ বসু: মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, চক্রবর্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৯২৫, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫।

৮. I firmly believe that we cannot have any thorough and extentsive culture as a nation, unless the knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson the past teaches. The darkness of Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India, — the dark depth of ignorance all round will never be illuminated until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars.

— Gurudas Bandyopadhay: Convocation Address , 1891. Hundred Years of the University of Calcutta, 1957, p.142.

৯. tagoreweb.in/

http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষা, ১৯৪৪, (পুনর্মুদ্রণ:১৯৬০) কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ১৮৯।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিক্ষা, ১৯৪৪, (পুনর্মুদ্রণ:১৯৬০) কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ৩১০।

১২, সরকারি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আক্রমণের ঘটনা ১২৫৭ (কলকাতায় ৩৭৬)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এধরনের ঘটনার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা /এবং শিক্ষকরা পরবর্তী প্রতিশোধমূলক বড় ধরনের আক্রমণের আশঙ্কায় আক্রমণ বা/এবং অবমাননা নীরবে সহ্য করেছেন। স্বভাবতই পুলিশের খাতায় তার কোনো উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাড়া শুধু ইংরেজ-মাধ্যম নয়, হিন্দি-মাধ্যম, উর্দু-মাধ্যম বা কোনো মিশনারি বিদ্যয়তনের এতটুকু শান্তি বিঘ্নিত হয় নি।